Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 300
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 294 - 300
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রামমোহন ও ডিরোজিও : চিন্তনে ও মননে একত্ব ও বৈপরীত্য

অমৃতা হাজরা
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: amrita.hazra1010@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Bengal Renaissance, social reforms, colonial Bengal, vedic monotheism.

Abstract
19th century was a phase of significant intellectual excitement as well as a very important time in the history of modern India. Reeling under the political and economic burden of British conquest, Indian society changed gradually. Accepted values were being questioned. In this unsettled background, there was an urgent need for reform and regeneration of its institutions. In this mentioned context, present paper reorients the relationship between Raja Rammohan Roy and Henry Louis Vivian Derozio, two renown progressive person (social reformer) during the Bengal Renaissance in 19th century. Bengal Renaissance became a phenomenon in the colonial era in the sphere of society, education, religion so on and so forth. This paper attempts to evaluate a comparative discussion between Rammohan Roy and Derozio in order to understand their nature of work and to provide a critical analysis of this phenomenon.

Discussion

মধ্যযুগীয় ভারতে তথাকথিত অন্ধকার যুগের পরে নতুন আলো ও আধুনিকতার যুগ শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষ বিশেষত বাংলার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দী হল গৌরবময় যুগ। ঊনবিংশ শতকের সূচনায় ভারতে বিরাজমান ব্রিটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সমাজে (বিশেষ করে বাংলায়) উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছিল। অনন্য পদ্ধতিতে বাংলা এক বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ প্রত্যক্ষ করেছিল ইউরোপীয় শৈলীর অনুসরণে যাকে ‘রেঁনেসা’ বা ‘নবজাগরণ’ বলা যেতে পারে। বঙ্গীয় ‘রেঁনেসা’-র ধারণাটি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে স্থবির হওয়ার পরে সমাজ-সংস্কৃতির একধরণের পুনর্জন্ম, জাগরণ বা পুনরুজ্জীবনকে নির্দেশ করে। নিঃসন্দেহে এই জাগরণ পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফসল। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের নতুন তরঙ্গ সমসাময়িক মন ও জীবনকে আমূল পরিবর্তিত করেছিল। পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতনতার ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বাংলা ছিল অগ্রগণ্য।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 300
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বর্তমানের আলোকে অতীতের পুনর্ব্যাখ্যা করাই হল 'নবজাগরণ'। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পার্থক্যের সম্মুখীন হয়ে অতীতের পুনর্ব্যাখ্যাকারী হয়ে উঠেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বেদ-উপনিষদের কাল থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ, এমনকি ঊনবিংশ শতকের সূচনা পর্যন্ত সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তন, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের অন্তরালে অসাম্প্রদায়িক উদার সার্বভৌম অধ্যাত্মসাধনার ধারাটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান। ঊনবিংশ শতকে রামমোহন নিজেকে তারই অন্তর্গত বলে দাবি করেছেন এবং এই আদর্শটিকেই দেশে নবাগত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে পরিমার্জিত করে তার ভিত্তিতে যুগোপযোগী নতুন জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন।[১] রামমোহন রায়ের সঙ্গে শুরু হওয়া এই মহান বুদ্ধিবৃত্তিক উত্থান সময়ের অগ্রগতিতে নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে যখন একদল তরুণ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ সমাজে প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই গোষ্ঠী 'নব্যবঙ্গ' নামে পরিচিত, যার পথপ্রদর্শক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম কিছু দশক ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সময় হিসাবে বিবেচিত এবং একথা সহজেই বলা যায় যে মূল্যায়নগত দিক থেকে একজন ব্যক্তি যিনি এই সময়ের প্রতীক, তিনি হলেন রামমোহন রায়। ভারতীয় জাতীয় জীবনে রামমোহনের চিন্তা প্রতিফলিত হতে শুরু করে ১৮১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার সময় থেকে। প্রথাগত পদ্ধতির উপলব্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্ম-বিবৃতি নির্মাণের উদ্যোগের ফলে রামমোহনকে কেন্দ্র করে এক জিজ্ঞাসুমণ্ডলী গড়ে ওঠে, যার মিলনকেন্দ্র ছিল রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা (১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ)।[২]

পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে আত্মস্থ করে নৈতিক-বুদ্ধিগত-বস্তুগত ভাবেও রামমোহন বিশিষ্টতার পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। তাঁর চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ধার্মিকতা, যা হিন্দু-ইসলাম-খ্রিস্টান ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে উদ্দীপিত ছিল। বৈদিক একেশ্বরবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর হিন্দু পরিচয় রক্ষা করেছিল। উনিশ শতকের শুরুতে বাঙালী হিন্দুদের সাধারণ গোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যগত রূপ এবং ধর্মীয় উপাসনার অনুশীলনগুলি অনুসরণ করেছিল। রামমোহন কর্তৃক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় উপাসনার নতুন ধারা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টার কারণে বাংলায় ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভগবানের ঐক্যের ধারণা এবং মূর্তিপূজার প্রতীকী প্রকৃতির ধারণা ভারতের শিক্ষিত হিন্দুসমাজে রামমোহনের আবির্ভাবের আগে থেকেই ছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার আগে থেকে রামমোহন ধর্ম বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। নিজ রচিত 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহিদীন' গ্রন্থে একেশ্বরবাদকে সকল ধর্মের ভিত্তি এবং মূর্তিপূজাকে এর বিকৃতি বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে মূর্তিপূজা-ই সকল ধর্মীয় বিতর্কের উৎস। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে হিন্দুবিশ্বাসের মূল ভিত্তি জনসাধারণের সামনে উন্মোচিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। পৌরোহিত্যের সমালোচনা করে সমাজ ও জনগণের নৈতিকতার অধঃপতনের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেন। রামমোহন চাইতেন সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ধর্মে কিছু পরিবর্তন আসা উচিত। হিন্দুধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ এবং উপনিষদের উপর ভিত্তি করে সহজতর ধর্মীয় উপাসনার কথা বললেও তিনি কখনো দাবি করেননি যে হিন্দু ধর্মের বাইরে গিয়ে এক নতুন ধর্ম তিনি প্রতিষ্ঠা করছেন। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তিনিই প্রথম শিক্ষিত এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু যিনি বহুঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁর আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত। এর সার্বজনীনতার চেতনা চিন্তার ক্ষেত্রে নবনির্মিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভাবকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।[৩] রামমোহনের নিজের ভাষায়, তিনি ব্রাহ্মণদের মূর্তিপূজাকে তাদের পূর্বপুরুষ ও প্রাচীন গ্রন্থের অনুশীলনের বিপরীতে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন যা তারা শ্রদ্ধাপূর্বক মান্য করত। তাঁর ধারণায় শাস্ত্রের কর্তৃত্ব সর্বদা তার যুক্তি সহ সঙ্গতির উপর নির্ভর করবে। এখানে একজন সমালোচনামূলক বিশ্লেষণাত্মক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যা ধর্মীয় পরিস্থিতিকে ঐতিহাসিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।[৪]

রামমোহনের সময়কালে উগ্রতাবাদের স্পষ্ট প্রবণতা 'ইয়ং বেঙ্গল' যুগে আক্রমণাত্মক রূপ নেয়। ডেভিড ড্রামন্ড প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মতলা আকাডেমি'র ছাত্র ডিরোজিও ছিলেন কলকাতার পোর্তুগিজ-ভারতীয় কুলজাত একজন ইউরেশিয়ান, যিনি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। মননের ক্ষেত্রে সর্বত্র যুক্তিমূলক জিজ্ঞাসা ও প্রাধান্য স্থাপনের পাশাপাশি সর্বপ্রকার শঠতা, ভণ্ডামী, মিথ্যাচার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে ছাত্ররা যাতে স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারে– সেই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 300
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিষয়ে তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। পাঠ্য বিষয় অনুশীলন বা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ছাড়াও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ছাত্ররা তাঁর পরামর্শ নিতেন। বহুবিধ সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত ঐতিহ্য-আবদ্ধ সমাজে তরুণ মনকে দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জাগরিত করার অভিপ্রায় থেকেই ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। মনের আলোড়ন সম্ভবত রক্ষণশীল চিন্তাভাবনার বিরোধী ছিল এবং ডিরোজিও তা সম্ভব করেছিলেন। রাধানাথ শিকদারের ধারণায়, সত্যের অনুসন্ধানের চেতনার একমাত্র কারণ ছিলেন ডিরোজিও।[৫] ডিরোজিওর অনুপ্রেরণা ও শিক্ষার দ্বারা তাঁর তরুণ ছাত্রদল সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করতে শুরু করে এবং সর্ববিধ ধর্মান্ধতা ও যুক্তিহীন আচারপরায়ণতার উপর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এই প্রখর যুক্তিশীলতা ক্রমশ তাদের বাক্যে ও আচরণে উগ্র নস্যাৎপ্রবণতারূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। হিন্দু সমাজের সমস্ত প্রচলিত সংস্কার ও বিধিনিষেধকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ, সুরাপান, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রূপ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অমর্যাদা প্রভৃতি আচরণ রক্ষণশীল সমাজের ঘৃণার কারণ হয়ে ওঠে। এই স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ রোধ করতে গোঁড়া হিন্দুসমাজ সচেষ্ট হয়। কিন্তু দমননীতি ছাত্রদের ডিরোজিও-সংসর্গ বন্ধ করতে পারেনি। রক্ষণশীল সমাজ ও পত্রপত্রিকাগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ডিরোজিও ও তার শিষ্যবর্গ সম্পর্কে অর্ধসত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হন। কলেজ কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক পদ থেকে ডিরোজিওকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি পদত্যাগ করেন। সম্ভবত তাঁর ছাত্রগণ সকলেই হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের যুক্তিবাদী সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারসমূহ। এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এরা বিলম্ব করেনি। হিন্দুধর্ম যে এদের আক্রমণের বিষয় ছিল সমসাময়িক সূত্রে তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত ডিরোজিও প্রভাবিত হিন্দু কলেজের তৎকালীন আবহাওয়া কেবল হিন্দুধর্মের নয়, কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মেরই অনুকূল ছিলনা– এমনকি খ্রিস্টধর্মেরও নয়। হিন্দুধর্মের প্রতি নব্যবঙ্গীয়দের আক্রমণ যেমন হিংস্র ছিল, তার তুলনায় খ্রিস্টধর্মসমালোচনা ছিলনা। ডিরোজিও-শিষ্যগণের বিরুদ্ধাচরণের ফলে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ যে পরিমাণ বিপর্যস্ত হয়েছিল, খ্রিস্টধর্ম বা খ্রিস্টীয়সমাজ তা হয়নি। ধর্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী হলেও তিনি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেও তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও সত্যানুসন্ধিৎসা তাঁকে খ্রিস্টীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত সংকীর্ণতা থেকে দূরে রেখেছিল। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। খ্রিস্টধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা না থাকলেও তিনি কখনো তার ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা বা ধর্মবিষয়ক উপদেশ দেননি।[৬]

ধর্মীয় দিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে; রামমোহন সব ধর্মের সারসংগ্রহ করতে চেয়েছেন, ধর্ম তাঁর কাছে ছিল নীতিজ্ঞান ও শাস্ত্রবিশ্বাস। এই কারণে রামমোহনকে ডিরোজিও 'হাফ-লিবেরাল' বা আংশিকভাবে প্রগতিশীল বলেছেন। ফলত পরিপূর্ণ যুক্তিবাদের সঙ্গে অর্ধস্ফুট যুক্তিবাদের বিরোধ অনিবার্য। প্রধানত হিন্দুসমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ডিরোজিওপন্থীদের বিদ্রোহ। রামমোহন হিন্দু পৌত্তলিকতার অঞ্চল ত্যাগ করেন, কিন্তু সেই পৌত্তলিকতার সঙ্গে বিচ্ছেদ যখন ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের অবসানে প্ররোচিত করল না তখন তারা সমালোচনা করেছেন। রামমোহনগোষ্ঠীর অনেকের সম্পর্কে ডিরোজিওর বক্তব্য, এদের মতে ও আচরণে মিল নেই। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি (ডিরোজিও) ছিলেন নিরপেক্ষ, রামমোহনের তত্ত্বজিজ্ঞাসার সমর্থক ছিলেন না। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন বললে সবটুকু বলা হয়না। তিনি ছিলেন সত্যের দিশারী, সত্যের পূজারী। হিন্দুধর্মের বর্তমান অধঃপতিত রূপটিই তাদের (ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামী) নিকট ছিল এর সমগ্র রূপ; বর্তমানে প্রচলিত নানা বিকৃত আচার ও কুসংস্কারের বাইরে হিন্দুসভ্যতায় যে মহৎ ও গ্রহণযোগ্য কিছু থাকতে পারে এমন ধারণা তাদের ছিল না। হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত সবকিছুই অশ্রদ্ধেয় ও বর্জনীয় – দেশের ও সমাজের অধঃপতনের কারণ। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরবিশ্বাস রামমোহনের জীবনে মূলমন্ত্র ছিল, তাই তাঁর নিকট সন্দেহবাদ বা নাস্তিকতার তুল্য মহা অনর্থ আর কিছু ছিলনা। বেদ-উপনিষদ প্রোক্ত ব্রহ্মবাদ ও একেশ্বরবাদের ভাবধারায় নিষিক্ত হয়ে তিনি নিজেকে হিন্দু বলতে দ্বিধা করেননি – এই উদার ব্রহ্মবাদ-ই ছিল তাঁর কাছে হিন্দু ধর্মের সারবস্তু।[৭] পৌত্তলিকতা না মানা আর ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ কখনোই এক নয়।

'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি'র ডেভিড ড্রামন্ড তাঁর ছাত্রের মানসভূমিতে সাহিত্য-দর্শনের চিন্তাধারা বপন করেছিলেন। যুক্তিবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউমের শিষ্য ড্রামন্ড তার ছাত্র ডিরোজিওকে নবযুগের ন্যায়দর্শনে দীক্ষিত করেছিলেন। নির্মম

যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির অগ্নিপরীক্ষায় যাচাই না করে কোনো মতামত গ্রহণ না করার জীবনাদর্শের উত্তরাধিকার বহন করে ডিরোজিও এদেশের তরুণদের কাছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডিরোজিও মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন না, দার্শনিক ছিলেন না; যুগের বাঞ্ছিত দার্শনিকদের ব্যাখ্যাকারী ছিলেন তিনি। কোনো নতুন সত্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেননি, জ্ঞানতত্ত্বে কোনো নতুন অঙ্গীকার আনেননি। এমনকি নতুন কোনো পদ্ধতিবিজ্ঞান-ও তিনি নির্মাণ করেননি। তিনি পড়তেন, জানতেন, বুঝতেন এবং তা প্রচার করতেন।[৮] ডিরোজিও এবং তার শিষ্যগণ এমন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল যখন বেন্থামাইট উদারবাদ এবং উপযোগিতাবাদের প্রভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। সমাজকে অপ্রয়োজনীয় প্রথা ও ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করার পক্ষে উপযোগবাদী যুক্তি ও মানবাধিকারের যৌক্তিক গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ উচ্চস্থান লাভ করতে থাকে। এমতাবস্থায় দার্শনিক মৌলবাদী নামে পরিচিত ডিরোজিও এবং তার শিষ্যগণের আবির্ভাব সমাজে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে। দার্শনিক বেকন-হিউম এবং টম পেইন দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। পেইনের ‘এজ অব রিজন’ ডিরোজিও পন্থীদের বাইবেল হয়ে উঠেছিল। ডিরোজিওর মানস মুখ্যত বায়রণীয় রোমান্টিকতার প্রভাবে গঠিত – তাঁর দার্শনিক যুক্তিবাদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে তাঁর রোমান্টিক মনোভাব প্রতিফলিত। তিনি যে তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে (১৮০৯-১৮৩১) রামমোহনের মত নানা ভাষায় বিভিন্ন ধর্মমতের মূল্যানুসন্ধান ও নানা সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুশীলন করেছিলেন– এমন প্রমাণ নেই। তিনি যে দর্শনচর্চা করতেন তা সমসাময়িক ইউরোপীয় দর্শনের এক বিশেষ ধারা, বেকন-হিউম-কান্টের রচনায় যা প্রকাশিত। অপরপক্ষে, রামমোহন যেমন একদিকে বেকন-লক-হিউম-ভলতেয়ার প্রমুখের দার্শনিক রচনায় কৃতবিদ্য ছিলেন তেমনভাবে ভারতীয় দর্শন (বেদান্ত-ন্যায়-মীমাংসা-তন্ত্র প্রভৃতি) ও ইসলামীয় যুক্তিবাদী দর্শনে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। কিন্তু হিন্দু দর্শন সম্পর্কে ডিরোজিওর জ্ঞান ছিল – এরূপ তথ্য নেই। ইহুদী, খ্রিস্টীয়, মুসলিম শাস্ত্রেও তাঁর যে বিশেষ অধিকার ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়না। স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী হলেও জন্মসূত্রে পাওয়া খ্রিস্টধর্ম তিনি ত্যাগ করেননি। ভারতবর্ষীয় জীবনচর্যার অন্তর্নিহিত চিরন্তন মূল্যবোধগুলির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশত রামমোহন যে স্বাজাত্যবোধের অধিকারী হয়েছিলেন, ডিরোজিওর দেশভক্তি আন্তরিক হলেও তার মূল জাতীয় সংস্কৃতির সেই গভীরে প্রবেশ করেনি বরং তার মধ্যে উচ্ছ্বাসের ভাগ ছিল বেশি। জাতীয় শাস্ত্রের সারভাগ বিশ্বের অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত করে সামগ্রিক ভাবে যুক্তিবিচারের দ্বারা পরিমার্জিত করে গ্রহণ করবার মনোভাব বোঝার মত অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি ডিরোজিওর ছিলনা। স্বীয় মনীষার প্রাখর্য সত্ত্বেও রামমোহনের প্রজ্ঞার গভীরতা বা দূরদৃষ্টির অধিকারী ডিরোজিও হননি।

শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওর প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্রগণের মনে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উন্মেষসাধন। বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা সর্ববিধ সমস্যার সমাধানে উপনীত হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। অধিকন্তু তার আদর্শ ছিল নৈতিক সততা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা। যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তসমূহ আচরণের মাধ্যমে জীবনে রূপায়িত না হলে জীবনচর্যা সম্পূর্ণ হয়না – এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই ধারণা তাঁর শিষ্যমন্ডলীকেও প্রভাবিত করেছিল। এই ভাবে ডিরোজিওর শিক্ষার যুক্তিবাদী আবহাওয়ায় যে তরুণগোষ্ঠী গড়ে উঠল, উত্তরকালে তাদের অনেকেই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ডিরোজিও শিষ্যমন্ডলীর আদর্শবাদে কোনো ছিদ্র ছিল না। আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগে এরা কখনো পশ্চাদ পদ হয়নি। পক্ষান্তরে, রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতির অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে তাঁর অনুবর্তীগণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতেন। প্রকাশ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্মে অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেন অথচ নিজ পরিবারে পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দিয়ে প্রতিমাপূজার অনুষ্ঠান করতে দ্বিধা করেন না। উল্লেখ্য, রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীগোষ্ঠীর অনেকের এই আচরণগত পার্থক্য তাদের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বলা যায়, রামমোহনের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে যারা তার চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মানুষ রামমোহন অপেক্ষা নিম্নভূমিতে অবস্থান করতেন। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিলনা এমন নয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হলে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন তা তাদের চরিত্রে ছিলনা। রামমোহনের ইংল্যান্ড গমনের পর প্রায় সকলেই ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন – যা থেকে স্পষ্ট, মণ্ডলীভুক্ত সকলের আন্তরিকতা গভীর ছিল না। সুতরাং, এদের সম্পর্কে ডিরোজিওর বিরূপ সমালোচনা যে অনেক পরিমাণে যথার্থ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 300
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র ব্যতীত সকল ধরনের প্রগতিশীলতার প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবর্গের মতৈক্য ছিল। 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী পোষিত যেসব ভাবধারা উল্লেখ করা হয়েছিল তা হল – ১. প্রগতিশীল সমাজসংস্কার, ২. শিক্ষাবিস্তার, ৩. চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি। প্রতিটি আদর্শই রামমোহনের চিন্তায় পূর্বেই প্রতিফলিত। ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এ স্বাধীন চিন্তা, ভবিতব্য, পাপপুণ্য, দেশাত্মবোধ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, গোঁড়ামি, পুরোহিততন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তর্কবিতর্ক হত। আলোচনা সভায় সর্ববিষয়ে মতামত প্রদানের স্বাধীনতা সকল সদস্যের থাকত। নারী সমাজের দুর্গতিতে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে তাদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত আলোচনাও করা হত। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যগণ গোঁড়া বন্ধন থেকে মুক্তি, ঐতিহ্যগত রীতিনীতি, ধর্মীয় অস্পষ্টতা এবং প্রচলিত সংস্কারের বিরোধিতা করেছে। তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল দর্শনীয়। নব্যবঙ্গীয় আন্দোলন ছিল দেশের রাজনৈতিক চেতনার অগ্রদূত। তাদের লেখা ও বক্তৃতায় রাজনৈতিক সচেতনতা প্রতিফলিত হয়েছিল। স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন শাসন, সত্যের পবিত্রতা সহ বিতর্কসভার অন্যান্য কার্যক্রমকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য 'পার্থেনন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ডিরোজিওর পদত্যাগে নব্যদল হতোদ্যম হয়নি। বিদ্যালয়, সভা-সমিতি, সংগঠন ও পত্রিকা প্রকাশনে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রামমোহন রায় পরিচালিত 'সম্বাদ কৌমুদী'তে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের শিক্ষাবিষয়ক কর্মপ্রয়াস সপ্রশংস উল্লেখিত হয়েছে। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তরুণ শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষক ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় সামাজিক মিথ্যাচার, অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর অভ্যন্তর থেকে তর্জন-গর্জন করতে আরম্ভ করছে তখনও নবযুগের অধিনায়ক রামমোহন রায় পূর্ণগৌরবে কলকাতার সামাজিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।[১০] যুক্তিবাদী উদারপন্থী রামমোহন প্রগতিশীল সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্থাপন প্রভৃতি কাজে বহুপুর্বেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মত সামাজিক প্রথার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। নারী জাতির উন্নতির জন্য তাঁর অপরিসীম প্রচেষ্টা তর্কের অপেক্ষা রাখে না। সতীদাহের নৃশংস রীতি বন্ধ করার জন্য রামমোহনের অটল সংগ্রাম নারী মুক্তির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহের পক্ষে নিজ মত রামমোহন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁর চিন্তা ছিল আধুনিক। সামাজিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের স্বনির্ভরতার প্রয়োজন বেড়ে যায়– একথা তাঁর কাছে ছিল স্পষ্ট। শিক্ষা প্রসারের কাজে তাঁর সমর্থক ছিলেন ডেভিড হেয়ার, ডাফ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখরা। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভা' ও হিন্দুসমাজ তার ঘোরতর বিরোধিতা করে। সমাজের তীব্র বিরোধিতা রামমোহনকে আটকাতে পারেনি। স্ত্রীশিক্ষার গতিরোধ করতে রক্ষণশীল সমাজ ব্যর্থ হয়। নারীশিক্ষার জন্য বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। স্ত্রীজাতিকে শিক্ষায় ও আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি এবং প্রগতির সেই পথ উন্মুক্ত করতে তিনি সফল হন। উদার চিন্তাধারা, সর্বধর্মকে সমান সম্মান দেওয়া, হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করা, শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক করা, নারীর সম্মান রক্ষায় সংগ্রাম করা – এ সবকিছুই রামমোহনের বৈপ্লবিক অবদান।[১১] আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সমাজে প্রচলিত কু-সংস্কার ও কু-প্রথার বিরুদ্ধে ডিরোজিও এবং তার নব্যবঙ্গদল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বর মানেন না একথা বলেননি। তাঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসু। রামমোহনের থেকে তাদের পার্থক্য এখানেই; তারা শুধু সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেননি, বিধবা বিবাহের প্রস্তাব করেছেন। অধিকন্তু তাঁরা হিন্দু বিবাহবিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু হিন্দু পরিবারপ্রথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেননি। যুক্তির মহাপটে তারা জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, বেদান্তের ভিত্তিতে এদেশে একেশ্বরবাদ পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস রামমোহনকে বেশকিছু কু-সংস্কারের মুখোমুখি করেছিল। বেদান্তের সর্বেশ্বরবাদী ও সমাজবিরোধী ধারণাগুলি সাধারণ মনের গভীরে এতটাই প্রোথিত ছিল যে তা সহজে অস্বীকার করা যেত না। ফলত নিজ দেশবাসীর জন্য তিনি যে নতুন ধর্মীয় সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটাতে চেয়েছিলেন তা তাঁর গোঁড়া সমসাময়িকদের দ্বারা নিছক ব্যঙ্গচিত্র হিসাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। সীমিত সংখ্যক আলোকিত ব্যক্তিকে তিনি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতি যাদের বিশ্বাস ইতিমধ্যেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।[১২] একইভাবে, প্রাথমিক জীবনে ডিরোজিও এবং তার নব্যবঙ্গদল নিন্দিত হয়েছিলেন। একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসাবে তাদের হীন প্রমাণ করা প্রবণতা স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। ইতিবাচক দিক থেকে তারা অবশ্যই যুক্তিবাদী চেতনা, প্রশ্ন ও

প্রত্যাখ্যানের মনোভাব জাগরিত করেছিল। কিন্তু তারা তাদের নেতিবাচক মনোভাবের জন্য অধিক পরিচিত ছিল। ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন মতামতের উপর অত্যধিক জোর দিয়ে তারা কার্যত বিদ্যমান সমাজের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।[১৩]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে রামমোহন-ডিরোজিওর মধ্যেকার পার্থক্যসমূহ স্পষ্ট। তথাপি (পার্থক্য সত্ত্বেও) ডিরোজিওর প্রধান শিষ্যগণ যে রামমোহন সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তা অনুধাবন করা যায়। ডিরোজিও অনুপ্রাণিত নব্যবঙ্গ দলের চিন্তায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট, রামমোহনের চিন্তায় পূর্বেই তা লক্ষণমন্ডিত। সমকালীন সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনায় দেখা যায়, সাময়িক বিরূপতার উচ্ছ্বাস কাটিয়ে রামমোহনের জীবদ্দশাতেই ইয়ং বেঙ্গল প্রধানদের অনেকে (তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখরা) রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েছেন এবং এই শ্রদ্ধা উত্তরকালে আরো গভীর হয়েছে। ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবেই এদের চিত্ত সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ হলেও প্রায় একই সময়ে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাও যে সেইসব প্রস্ফুটিত মানসকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ছাড়াও এক ঋণাত্মক ভূমিতে আলোচ্য দুই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সমপর্যায়ের ছিল – তা হল রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক নিন্দা ও নির্যাতন। বাল্যে গৃহ থেকে বিতাড়িত, উত্তরকালে আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং সর্বধর্মের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক নিন্দিত ও নিপীড়িত রামমোহনকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে অধ্যক্ষ সভা থেকে বর্জন করা হয়। বস্তুত দেশ ও সমাজ সেবার মূল্যস্বরূপ আমৃত্যু রামমোহনকে রক্ষণশীল আক্রমণ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। একই সঙ্গে, ডিরোজিও ও তৎপ্রভাবিত দলের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল চক্র সমানভাবে সক্রিয়। এদের প্রচেষ্টায় ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কর্মজীবনে নির্যাতন ছাড়াও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর তরুণদের আত্মীয়স্বজন ও সমাজের বিরূপতা সহ্য করতে হয়েছিল। সুতরাং, ডিরোজিও-তাঁর অনুগামী এবং রামমোহনের মধ্যে অভিজ্ঞতার রাজ্যে একটি সমভূমি আবিষ্কার করা যায়। যদিও ব্যক্তিগতভাবে এই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর রামমোহন-নির্যাতন যত দীর্ঘস্থায়ী ছিল, ডিরোজিও বা নব্যবঙ্গের ক্ষেত্রে তা হয়নি; পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের কারণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিকতায় অতি দ্রুত পরিবর্তন আসছিল। রক্ষণশীল সমাজের নিন্দা কুৎসা এক্ষেত্রে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে যায়।[১৪]

ঊনবিংশ শতকীয় বাংলার সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিশ্লেষণে কিছু ক্ষেত্রে মনে হতে পারে রামমোহন-সৃষ্ট প্রগতিশীল ভাবধারা এবং ডিরোজিও ও তৎপ্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গল প্রবর্তিত যুক্তিবাদী মানসিকতা চিন্তারাজ্যের দুই সমান্তরাল প্রবাহ, এরা কোথাও পরস্পরকে স্পর্শ বা প্রভাবিত করেনি। ঐতিহাসিক রচনায় এমন কথাও পাওয়া যায় যে ডিরোজিও-শিষ্যগণের রামমোহন কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলনা কারণ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন যখন ইংল্যান্ডে যান, তখন এরা সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক (ব্যতিক্রম তারাচাঁদ চক্রবর্তী)। তাছাড়া ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর তরুণরা এসেছিলেন সমাজের মধ্যবিত্ত স্তর থেকে, কিন্তু রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা ছিলেন উচ্চবিত্ত ভূস্বামী। ফলত তাদের মধ্যে চিন্তাচেতনার মিথস্ক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে মতামতগুলির পুনঃবিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়। বয়স বা সময়ের ব্যবধান ভাবশিষ্য হওয়ার পথে বাধা নয় সেকথা সর্বজনবিদিত। সুতরাং, অপ্রাপ্তবয়স্কতার কারণে তারা রামমোহন কর্তৃক প্রভাবিত হননি – একথা বিশ্বাস করা যায়না। ডিরোজিও শিষ্যগণের কেউ রামমোহনের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তার চিন্তা ও কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য ও প্রগতিশীলতা উপলব্ধি করার উপযুক্ত মানসিক পরিণতি অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে অনেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি কিন্তু তাঁর ভাবধারা তাদের চিত্তকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ইতিহাসের নির্ভুল সাক্ষ্য এই যে, এদের জগৎ ও রামমোহনের জগৎ পৃথক ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন দুই স্বতন্ত্র পৃথিবী নয়; প্রগতির দুই ধারা পরস্পরের পরিপূরকরূপে সম্পূর্ণ মিলিত হয়েছে। রামমোহন ও ডিরোজিওর পন্থাকে 'রিফর্মেশন' বা সংস্কার এবং 'রেঁনেসা' বা নবজাগৃতি আখ্যা দেওয়া অনুচিত। রামমোহন এবং ডিরোজিও – উভয়ের চিন্তাবিশ্লেষণেই 'রেঁনেসা' ও 'রিফর্মেশন' প্রসূত চিন্তাধারা যুগনদ্ধ।[১৫]

রামমোহনের জীবনকাল পর্যালোচনায় বোঝা যায়, প্রথমজীবনে শাস্ত্রপ্রমাণকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তিনি স্বীয় ধর্মচিন্তাকে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি স্বীকার করেন মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তায় শাস্ত্র মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে। রামমোহনের পর ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার যারা গ্রহণ করেন, রামমোহনের ন্যায় সার্বভৌম দৃষ্টি তাদের ছিলনা। অন্যদিকে, ডিরোজিওর শিষ্যগণের প্রতিবাদ জাগরিত হয়েছিল গুরুর চিন্তাভাবনার আলোকে যা কথা

ও কাজের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য দাবি করে। সম্মুখে প্রচারিত আদর্শকে জীবনে রূপায়িত না করা তাদের কাছে নৈতিক অপরাধ। প্রতিবাদের ভূমিতেও ডিরোজিও-রামমোহন পাশাপাশি আছেন। যুগ্ম প্রতিবাদের ফলেই ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিশ্বাসে বিপ্লবী রূপান্তর ঘটেছিল। সযত্ন অনুশীলিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সংগঠিত কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য ডিরোজিও-শিষ্যগণ পরোক্ষভাবে রামমোহন-শিষ্যের কাছে ঋণী ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' রামমোহন-ডিরোজিও ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়েছিল। রামমোহন বা রামমোহনপন্থীদের সঙ্গে ডিরোজিও বা ডিরোজিওপন্থীদের বিরোধ অবিমিশ্র বিরোধ নয়। রামমোহনের সকল উদ্যোগ-আয়োজন ডিরোজিওপন্থীদের বাঞ্ছিত উত্তরাধিকার। তাই তারা বহুস্থলে মিলেছেন, অনেক স্থলে মিলতে পারেননি। রামমোহন যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে নব্যবঙ্গগণ (অনেকে) সেই জীবনচর্যা গ্রহণ করেছিল। উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে ডিরোজিও প্রভাবিত তরুণগোষ্ঠী সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে সাংগাঠনিক ভিত্তিতে সেই আদর্শকে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। রামমোহন ও ডিরোজিও-র প্রগতিশীল ঐতিহ্যধারা কালক্রমে একই স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়ে একটি অগ্রগামী সামাজিক শক্তিতে রুপান্তরিত হয়েছিল এবং একই লক্ষ্য অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছিল।

Reference:

১. বিশ্বাস, দিলীপ কুমার, রামমোহন সমীক্ষা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৮৩, পৃ. ৫-৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬-৪১৭
৩. মুখার্জী, অমিতাভ, "দ্য রিলিজিয়াস ফারমেন্ট ইন বেঙ্গল", রেনাসেন্ট বেঙ্গল ১৮১৭-১৮৫৭, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ৪০-৪৪
৪. পোদ্দার, অরবিন্দ, রেঁনেসা ইন বেঙ্গল : কোয়েস্ট অ্যান্ড কনফ্রন্টেশনস্ ১৮০০-১৮৬০, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি, ১৯৭০, ফেব্রুয়ারী, পৃ. ৫৬
৫. ব্যানার্জী, তারাশঙ্কর, 'দ্য ইয়ং বেঙ্গল : এ জেনেরাল এস্টিমেট', রেনাসেন্ট বেঙ্গল ১৮১৭-১৮৫৭, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ৫৫
৬. বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, পৃ. ৪১৮-৪২৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪-৪৩৫
৮. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, 'হিন্দুকলেজ : ডিরোজিও : আধুনিকতা', ডিরোজিও, স. রমাপ্রসাদ দে, শশধর প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ৭৭
৯. বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, পৃ. ৪৩৩-৪৩৭
১০. ঘোষ, বিনয়, বিদ্রোহী ডিরোজিও, অয়ন, ১৯৫৭, পৃ. ৬৫
১১. চক্রবর্তী, রেণু, 'রামমোহন ও নারীমুক্তি', রামমোহন স্মরণ, স. পুলিনবিহারী সেন, ১৯৬০, পৃ. ১৯৭-২০২
১২. শাস্ত্রী, শিবনাথ, হিস্ট্রি অব দি ব্রাহ্ম সমাজ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ১৯১১, পৃ. ৭২-৭৩
১৩. ব্যানার্জী, তারাশঙ্কর, 'দ্য ইয়ং বেঙ্গল: এ জেনেরাল এস্টিমেট', রেনাসেন্ট বেঙ্গল ১৮১৭-১৮৫৭, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২, পৃ. ৫৯
১৪. বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, পৃ. ৪৫৮-৪৬৭
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১-৪৩২, ৪৬০-৪৬২